বিজ্ঞানমনস্কতার কলকাতা ঘোষণাপত্র - ২০২৪

[*সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের উদ্যোগে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং সামাজ বিজ্ঞানীদের যুক্ত করে পারস্পরিক মতবিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে* বিজ্ঞানমনস্কতার *একটি বিবৃতি তৈরি করা হয় যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ক জাতীয় কনভেনশনে গৃহীত হয়। প্রায় ২০০ জন বিজ্ঞানীর স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হল।*]

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ক বিবৃতি

সারসংক্ষেপ - বর্তমান ভারতে চলতি সমাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রকৃত অর্থে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি, সর্বজনীন জ্ঞানচর্চা ও বোধ ভিত্তিক বিজ্ঞানমনস্কতা বা বৈজ্ঞানিক মেজাজের প্রতি সংঘর্ষপূর্ণ মনোভাব ঘোষণা করেছে। স্বভাবতঃ প্রামাণ্য যুক্তি, বিশ্লেষণী মনন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া জরুরী। বিজ্ঞান প্রযুক্তির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনমানসে উত্তর-সত্য সংস্কৃতি, অশিক্ষার বিকাশ ও প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের উপর অনাস্থা তৈরি করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, মানবিক ও যৌক্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৮১ ও ২০১১-এ গৃহীত বিজ্ঞানমনস্কতা সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রের আশু নবীকরণ করা দরকার।

আমরা তিনটি পৃথক ফ্রন্টে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই: রাষ্ট্রের ভূমিকা; বৈজ্ঞানিক ও সারস্বত প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্ত করা; রাষ্ট্রীয় মদতে বিজ্ঞানের অপব্যবহার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার হরণ এবং অপবিজ্ঞান ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই। প্রমাণ নির্ভর চিন্তা চেতনা, নীতি নির্ধারণ এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে আমরা বিজ্ঞানী, সারস্বত সমাজ ও সমমনস্ক মানুষদের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে উর্ধে তুলে ধরার আহ্বান জানাই।

ভূমিকা - ১৯৮১ সালে বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ে কুন্নুর প্রতিবেদন এবং ২০১১ সালে পালামপুর ঘোষণার পর থেকে ভারত তথা সারা বিশ্বে উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই ঘোষণাগুলিতে উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য জনমানসে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে ভারতে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের আন্দোলনগুলি জনমনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিকশিত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে শক্তিশালী সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে এবং বিশ্বের অন্যত্র অভিনব পন্থায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রামাণ্য যুক্তি বা প্রকৃত অর্থে সর্বজনীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ হাজির করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী একটি উত্তর-সত্য সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ছে যা পরিকল্পিতভাবে অশিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইছে, মননশীল চিন্তার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করতে চাইছে এবং বিজ্ঞান চেতনাকে সচেতনভাবে খর্ব করতে চাইছে। মজার বিষয় হ'ল এই যে, আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই নেতিবাচক এই প্রবণতাগুলিকে সমাজ মাধ্যমে এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে যাতে করে এই সকল মনগড়া গল্প, কুসংস্কার, মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যানগুলি সাধারণ মানুষের চিন্তা ও মননে বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছে।

বর্তমান পরিস্থিতির এই পটভূমিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং মানববিদ্যার সঞ্চিত জ্ঞানের পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত জ্ঞানের আধারে বলিষ্ঠ, প্রমাণভিত্তিক যুক্তির জন্য নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া দরকার। জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখার সুপরিচিত পদ্ধতি ও উদীয়মান আন্তঃবিভাগীয় গবেষণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এই যুক্তিমালাকে আন্তরিকভাবে ও সহজবোধ্য ভাষায় সবার কাছে নিয়ে যেতে হবে। ভারতের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে আপামর মানুষের কাছে এই বিষয়টি জনপ্রিয় করা দরকার।

বিজ্ঞানমনস্কতা সম্পর্কিত সমসাময়িক এই প্রতিশ্রুতি বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অপরিহার্য। এই ঘোষণা পুরোনো বিবৃতির কোন সমালোচনা, পর্যালোচনা বা বিতর্ক করার জন্য নয়, বরং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাধারণ পদ্ধতি প্রকরণকে স্বীকার করে অতীতের আলোচনা-সমালোচনাগুলির মূল প্রতিপাদ্যকে স্বীকার করে। পুরোনো বিতর্কগুলি

পুনর্বিবেচনা করার পরিবর্তে বিজ্ঞানমনস্কতা, অনুসন্ধিৎসা ও মানবতাবাদ প্রসারের সাংবিধানিক বাধ্যতামূলক দায়িত্ব রক্ষার জন্য সমসাময়িক ভারতে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেগুলি চিহ্নিত করার দিকে নজর দেয়। বর্তমানে জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্র তথা বৃহত্তর সমাজে জ্ঞানানুসন্ধান, প্রমাণভিত্তিক যুক্তিচর্চা ও একাডেমিক উন্নয়নের ধারা আজ চরম বিপদের সম্মুখীন।

বিপজ্জনক রঙ্গমঞ্চ - আগেই বলা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিজ্ঞানমনস্কতা লালন করার ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্য ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, আগ্রাসী সমাজ-সাংস্কৃতিক শক্তির অবিরাম আক্রমণের পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্কতা বিরোধী সরকারী ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ ক্রমাগত প্রতিস্পর্ধী অবস্থান নিয়েছে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি তাই তিনটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়ে আলোচনাসমৃদ্ধ বোঝাপড়া এবং পদক্ষেপ দাবি করে: রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের ভূমিকা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সারস্বত প্রতিষ্ঠানের চরিত্র ও কার্যকারিতা এবং সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তার ক্ষতিকর প্রভাব।

ভারতের সংবিধানের 51A(h) উপধারায় বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে নাগরিকদের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি বলে কোন কোন মহল থেকে দাবি করা হয়। নাগরিক কর্তব্য বিষয়ে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব অন্তর্নিহিত থাকলেও স্পষ্ট বর্ণনার প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্রের ভূমিকা – স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েকটি দশক আমাদের দেশ বিজ্ঞানী[১] ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর উল্লেখযোগ্য আস্থা রেখেছিল। উন্নয়নমূলক নীতিগুলি ছিল প্রামাণ্য যুক্তি সমৃদ্ধ। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষকেন্দ্রগুলি যথার্থ দেখভাল, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের সচেষ্ট আগ্রহসহ স্বায়ত্তশাসনে অগ্রাধিকার পেয়েছিল। বিজ্ঞান ও শিল্প সম্পর্কিত সময়োপযোগী নীতি প্রণয়নের ফলে পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞদল ছাড়াও দেশি, বিদেশি বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানীরা ছিলেন এই কাজের দিশারী। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রীয় এই কর্মকান্ডে ধর্মের ভূমিকা ছিল নগণ্য বরং ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈষম্যহীনতা ও সমস্ত ধর্মের প্রতি সমভাব প্রদর্শনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতার কুফল কখনোই পুরোপুরি দূর করা যায়নি।

পরবর্তী সময়ে আমলাতান্ত্রিকতা, আভিজাত্যবোধ এবং প্রযুক্তি-সর্বস্ব মানসিকতা সামগ্রিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। সাধারণ মানুষও দূরে সরতে থাকে, প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা জনমনে স্থান পায়। এবং প্রাথমিক পর্যায়ের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে জনস্বার্থের বিপরীতে সরকারী ও কর্পোরেট স্বার্থরক্ষায় এই ব্যবস্থা সবিশেষ আগ্রহী। এই সময়ে সরকারী ব্যবস্থার সমালোচনায় সুশীল সমাজ, পেশাজীবী ও সমাজকর্মীদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার না করলেও ছোটদের এবং বৃহত্তর জনমনে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে যুক্ত ছিল, বিজ্ঞান ভাবনা প্রসারকে সমর্থন করেছিল এবং শাসন ব্যবস্থায় অবশ্যই বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীদের সাথে জনসাধারণের আলোচনার পরিসরটিকে উন্মুক্ত রেখেছিল।

[(১) এই ঘোষণাপত্রে, 'বিজ্ঞানী' ও 'বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান' শব্দগুলি সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, মানববিদ্যার শাখাসমূহ এবং জ্ঞানচর্চার সমস্ত অনুসরণকারীকে বোঝানো হয়েছে।]

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবনতি - বর্তমানে রাষ্ট্র তার পূর্বতন অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে এসেছে। সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এখন সক্রিয়ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, স্বাধীন ও বিশ্লেষণী মনন, প্রমাণিত যুক্তি নির্ভর নীতি নির্ধারণের বিরোধী। এই বিরোধী অবস্থানটি সবিস্তারে ও নিরবচ্ছিন্ন দক্ষতায় জনমনে স্থায়ীভাবে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। উন্নয়ন ও গবেষণায় রাষ্ট্রীয় সাহায্য ইতিমধ্যে জিডিপি'র শতাংশ বিচারে তুলনামূলক অন্য দেশগুলির নীচে এবং ঐতিহাসিক বিচারে সর্বনিম্নে পৌঁছেছে যা আজকের সর্বব্যাপী জ্ঞানচর্চার যুগে দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীর উদ্বেগের বিষয়। মৌলিক গবেষণাকে নিরুৎসাহিত করে সস্তা শ্রমের দেশীয় জোড়াতালি প্রযুক্তিকে স্বনির্ভরতার নামে চালানো হচ্ছে।

প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের আরো একটি চিত্র হল শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন গবেষণা ও ফেলোশিপ অনুদানে অর্থসাহায্যে গুরুতর হ্রাস। পেশাগত উন্নতি এখন বিষয়নৈপুণ্য বা গবেষণার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নয়, প্রভাবশালী মতাদর্শের পক্ষে থাকা, চাটুকারিতা ও সরকারী নির্দেশের মান্যতার বিচারে হয়। উন্নয়নমূলক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং-

এ ভারতের অবস্থান সংশয়পূর্ণ, দেশীয় উন্নয়ন সমীক্ষার রিপোর্টও মিথ্যা তথ্যে পূর্ণ। এমনকি সরকারী প্রতিষ্ঠানও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ভাবাদর্শের পছন্দমত তথ্য প্রস্তুত করে। সরকারী তথ্যের পর্যালোচনা বাদ দিয়েই বিভিন্ন বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে কোন খোলামেলা আলোচনাকে নিরুৎসাহিত করতে বিশ্লেষণী মনন, বহুত্ববাদ ও স্বাধীন জ্ঞানচর্চাকে বাধা দেওয়া হয়। এই প্রবণতাগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রমাণ-নির্ভর নীতি প্রণয়নকে ক্ষুন্ন করে, সারস্বত সমাজ ও প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুদের হতাশ করে এবং বুদ্ধিজীবী বিরোধী মনোভাবকে উৎসাহিত করে।

বর্তমানে রাষ্ট্র ও তার সহযোগী সামাজিক শক্তিগুলি বিজ্ঞান-সম্মত ভাবনা ও তার পদ্ধতিগুলিকে দুর্বল করার কাজে লিপ্ত। রাজনৈতিক বৃত্তের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবৈজ্ঞানিক দাবি, কাল্পনিক প্রযুক্তিগত সাফল্যের দাবি এবং প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান বিষয়ে অতিরঞ্জিত ধারণাগুলি একটি উগ্র-জাতীয়তাবাদী আখ্যান তৈরি ও তার সমর্থনের জন্য ব্যবহৃত হয়। যুক্তিহীন দাবি, অস্পষ্ট পৌরাণিক উদাহরণ এবং পৌরাণিক গ্রন্থের অপব্যাখ্যাকে সম্বল করে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে অবদমিত করা হয়। এই জাতীয় কাল্পনিক ও অহংসর্বস্ব দাবিগুলি প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার উল্লেখযোগ্য অবদানকে খর্ব করে। অন্যান্য বৌদ্ধিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত কৃতিত্বকে অবদমিত করে রাখে। এই ধরণের দাবির সমালোচকদের সহজেই দেশবিরোধী বা ঔপনিবেশিক ভাবনার ধ্বজাধারী বলে চিহ্নিত করা হয়। বিজ্ঞান এবং প্রকৃত ইতিহাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবমূল্যায়ন করা হয়। মননশীল উৎকর্ষতার প্রাথমিক শর্ত - ভিন্নমত ও মতামতের বহুত্ব, বর্তমানে তাই চরম সংকটে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আক্রমণ - নৈরাশ্যের কথা হল যে, এই প্রবণতাগুলি প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। বলা দরকার যে, কার্যকরভাবে এসবের প্রতিরোধ না করলে পুরো প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যান্য সভ্যতার ভূমিকা ও তাদের যুগান্তকারী অবদানকে তুচ্ছ করে প্রাচীন ভারতে জ্ঞানের প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্বকে বিদ্যালয়স্তর থেকে উচ্চশিক্ষাস্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে প্রাচীন ভারত, চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্য সভ্যতার পাশাপাশি শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উত্থানে ইউরোপীয় দেশগুলির অবদান অস্বীকার কেবল মিথ্যাচার নয়, চরম বিভ্রান্তিকর। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের সংশোধিত পাঠ্যপুস্তকে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিশাল অগ্রগতিকে খাটো করে দেখা বা কাল্পনিক আখ্যান দিয়ে পূরণ করা বোকামির নামান্তর। অন্যদিকে এই সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক গুলিতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক বিষয় এবং বিজ্ঞান ও পরিবেশর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অধ্যায়গুলি পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরীক্ষা-ভিত্তিক ব্যবস্থায় এই প্রচেষ্টা বস্তুতপক্ষে বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনার অনুশীলনকে উৎসাহিত করে না। এবং শিক্ষার্থীদের উচ্চতর পড়াশোনা বা গবেষণার জন্য সক্ষম এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদানকারী সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে না।

'ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান' নাম দিয়ে প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চার একটি বিকৃত আখ্যান উচ্চশিক্ষাস্তরে বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। এই পাঠ্যসূচী একতরফাভাবে বৈদিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করে, প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের অন্যান্য ধারাকে অস্বীকার করে এবং বিশেষ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধারার বিরোধিতার জন্য মধ্যযুগের ভারতে তাৎপর্যপূর্ণ নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবনকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে। এই ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ও তির্যক দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি মুছে ফেলা বা পুনর্লিখন করা এবং বিশ্লেষণী ভাবনাকে বাধা দেওয়া শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার প্রবণতা বাড়াবে এবং ভারতের সমন্বয়মূলক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিকৃত মানসিকতা তৈরি করবে। অদূর ভবিষ্যতে এর ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সামাজিক সম্প্রীতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

সামাজিক আক্রমণ - সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ সামাজিক-রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ধর্মীয় গোঁড়ামি, অতীতমুখীনতা ও পুনরুত্থানবাদের বাড়বাড়ন্ত প্রত্যক্ষ করেছে। ধর্মীয় আচার ও উৎসব এবং সংগঠনের সাম্প্রদায়িক রূপগুলির প্রচার বেড়েছে। অসংখ্য ধর্মগুরু প্রভূত সম্পদ, বিশাল অনুগামী এবং অনেকক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। উচ্চ-মার্গের আধ্যাত্মিকতার আড়ালে অপবিজ্ঞান, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির এক নেতিবাচক বিশ্বাস ছড়ানো হচ্ছে।

রাষ্ট্র ও তার প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি পৌরাণিক কাহিনীকে ইতিহাস বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। সিংহভাগ মানুষের বৈচিত্রপূর্ণ ও বহুত্ববাদী ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে মিথ্যা আখ্যান তৈরি করা হচ্ছে। প্রামাণ্য তথ্য অস্বীকার করে 'নিরামিষ আহার'-কে ঐতিহ্যবাহী প্রাগৈতিহাসিক অনুশীলন ও অভ্যাসের নামে প্রচার করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যানুসারি তকমা দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জয়গান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাকে বিদ্রুপ করা এবং কোভিড মহামারীর সময়ে স্বাস্থ্য নিয়ে নানা কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রশাসনিকভাবে প্রচার করা হয়েছে। কোভিড ভাইরাস থেকে বাঁচতে প্রদীপ জ্বালানো বা থালা-বাটি বাজানোকে সরকারীভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি 'মহাজাগতিক কম্পন' নিয়ে 'নাসা'-র গবেষণার কথা উদ্ধৃত করে সামাজিক মাধ্যমে এর কার্যকারিতা নিয়ে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে। প্রশাসনিক উদ্যোগে নানা অবৈজ্ঞানিক দাবি প্রচার করতে খ্যাতনামা বিজ্ঞান সংস্থার নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীকে টিকিয়ে রাখতে প্রাকৃতিক নিয়মে হারিয়ে যাওয়া নদীগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে পুনর্ণির্মান করা হচ্ছে। সত্য ও মূল্যবোধের প্রতি মানুষের চিরন্তন শ্রদ্ধার আবেগকে ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির বীজ ছড়ানো হচ্ছে। প্রশাসনিক মদতে আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা, অপবিজ্ঞান, মিথ্যা ও অবাস্তব আখ্যান এবং নানা ষড়যন্ত্রমূলক কুৎসা সমাজ মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

পরিশেষে বলা, ভারতে বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিকাশে অন্যতম বাধা হল 'পরলোক' বিষয়ক ধর্মীয় বিশ্বাস। ধর্মীয় বিশ্বাস বা সংস্কার অতিপ্রাকৃতিক অনুভূতি বলে চিহ্নিত। এই ধর্মীয় বিশ্বাস বা সংস্কার থেকে উদ্ভুত কিছু ভাবনাকে বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদ তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় না। ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের অবশ্যই স্বীকৃতি আছে, থাকবে। একই সঙ্গে, অন্যের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ, বৈষম্যমূলক আচরণ বা জনবিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী প্ররোচনাকে প্রতিহত করতে হবে এবং তার অযৌক্তিকতাকে বর্জন করতে হবে। সামাজিক দুর্বলতা ও অশিক্ষার কারণে অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন এই সমাজের আঁধার দূর করতে আজকের ছোট ছোট লড়াইয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহত্তর লড়াইয়ে নামতে হবে। এই সংগঠিত চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবিলা করে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের লক্ষ্য স্থির রেখে প্রচারভিযান চালাতে হবে।

ঘোষণা - *বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে আগ্রহী, আমরা, বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও বৃহত্তর বৌদ্ধিক সমাজ স্বীকার করি যে বৈজ্ঞানিক মেজাজ বা মানসিকতা প্রসারের সংগ্রাম বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক। আমরা জানি যে, এই সার্বিক সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে আজকের চ্যালেঞ্জ হল এর মোকাবিলা করা ও প্রতিহত করা। সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা দুর্বল করার জন্য সংগঠিত বহুমুখী আক্রমণের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আমরা অবহিত। এই জাতীয় আক্রমণ কেবল মাত্র অপবিজ্ঞান, অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীনতা প্রচার করে না বরং কুসংস্কার, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও বৈষম্যকে উৎসাহিত করে এবং মানবিক মূল্যবোধগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করে। সারা ভারতে একটি একমুখী, সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় চেতনার প্রতি আনুগত্য নির্মাণ করার জন্য মিথ্যা আখ্যান, ভিত্তিহীন মতামত এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রচার করা হচ্ছে।*

আমরা সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করার গুরুত্বকে সোচ্চারে ঘোষণা করছি। আমরা জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা, অন্যান্য সমমনা সংগঠন এবং এই কাজে নিবেদিত ব্যাক্তিবর্গ বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের এই কাজে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি অনুরূপ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাই। আমরা সমমনস্ক সারস্বত সমাজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে আবেদন জানাই।

------O------